ছিটমহলবাসীর মুক্তি ও কূটনৈতিক সাফল্য

“সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়”- সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের পররাষ্ট্রনীতিতে লিপিবদ্ধ এ অনুচ্ছেদকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণপূর্বক দেশের স্বার্থকে সমুন্নত রেখে প্রতিবেশী ও অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্কোন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা অত্যন্ত বিচক্ষনতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এর আলোকে প্রায় সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক কূটনৈতিক সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ও রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে সকল ক্ষেত্রে সাফল্যের ঝুলি ভরা থাকলেও ছিটমহল সমস্যার সমাধানের সফলতা মানবিক কারনে এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত হয়েই থাকবে। ছিটমহল সম্পর্কে আমরা কমবেশি সবাই জানি। শব্দটির সূচনা মূলত ১৯৪৭ সালে সিরিল রেডক্লিফের মানচিত্র বিভাজন থেকেই। ছিটমহল বিনিময় চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়নের গুরুত্ব, মর্মার্থ বুঝতে হলে এ সম্পর্কিত দীর্ঘ ইতিহাস আমাদের জানতে হবে।

১৭৫৭-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর চলে ইংরেজদের দ্:◌ুশাসন-শোষণ। এসবের বিরূদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন, লড়াই-সংগ্রামের পর ভারতীয় উপমহাদেশকে স্বাধীনতা দেয়ার জন্য ১৯৪৭ সালের ১৫ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে “ইন্ডিয়ান্স ইন্ডিপেন্ডন্স অ্যাক্ট-১৯৪৭” পাস হয়। এ প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে নিযুক্ত শেষ ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের সময়ে বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমারেখা নির্ধারণের পরিকল্পনা করেন। তার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে সীমানা নির্ধারণ কমিশন গঠন করেন এবং ব্রিটিশ আইনজীবী সিরিল রেডক্লিফকে এই কমিশনের প্রধান করেন।

এ প্রেক্ষিতে সিরিল রেডক্লিফ ১৯৪৭ সালের ৮ জুলাই লন্ডন থেকে ভারতে আসেন। তিনি মাত্র ৬ সপ্তাহ কাজ করে ১৩ আগস্ট সীমানা নির্ধারণের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেন এবং ১৬ আগস্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় সীমানার মানচিত্র। কিন্তু রেডক্লিফের অদূরদর্শীতা, কমিশনের সদস্যদের নিষ্ক্রিয়তা, স্থানীয় জমিদারদের লোভ এবং তৎকালীন কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও হিন্দু মহাসভার খামখেয়ালিপনায় সীমানা নির্ধারণের কাজটি সঠিকভাবে করা হয়নি। ফলে এক দেশের

ভূখন্ডে থেকে যায় আরেক দেশের জনগণ। সীমান্ত অঞ্চলে শুরু হয় “নিজভূমে পরবাসী” পরিচয়ে ছিটমহলবাসীর বসবাস।

ছিটমহল হচ্ছে মূলত এক দেশের ভিতর অন্য দেশের ভূখন্ড। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সর্বমোট ১৬২ টি ছিটমহল রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ছিটমহল ছিল ১১১ টি; ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের ছিটমহল ছিল ৫১ টি যার মোট জমির পরিমান হচ্ছে যথাক্রমে ১৭,১৬০ ও ৭,১১০ একর। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ভারত-পাকিস্তান সীমানা নির্ধারণের সময় অনাকাঙ্খিতভাবে সৃষ্ট উভয় দেশের মালিকানাধীন এই ছিটমহলগুলোকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে রাখা হয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম সীমার বাইরে। ফলস্বরূপ মালিকানা সংক্রান্ত সংঘর্ষে ছিটমহলের মানুষদের তৈরি হয় পরিচয়- সংকট। তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন হয়ে উঠে দুর্বিষহ। এক রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আশ্রিত অন্য রাষ্ট্রের মালিকানাধীন নিরপরাধ জনগন কার্যত হয়ে পড়েন রাষ্ট্রহীন মানুষ!

২০১১ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের ভিতর ভারতের এবং ভারতের ভিতর বাংলাদেশের ছিটমহলগুলোতে যথাক্রমে ৩৭,৩৩৪ এবং ১৪,২১৫ জন লোক বাস করে। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রায় অর্ধলক্ষাধিক ছিটমহলবাসির দৈনিক আয় ছিল মাত্র ১৭ টাকা। মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ যোগাযোগ ব্যবস্থা, সুপেয় পানি, বিদ্যুৎ, ভোটাধিকার, কর্মসংস্থান এর সুযোগ-সুবিধা থেকে প্রায় বঞ্চিত ছিলেন তারা। ছিটের ছেলে-মেয়েরা যতই মেধাবী হোক না কেন, তারা আসল বাবা-মার পরিচয়ে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি কিংবা মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ করতে পারত না। কারণ, উক্ত বিদ্যালয় বা পরীক্ষা-বোর্ডের দেশে পরীক্ষার্থী ও তাদের মা-বাবা ভিনদেশী। তাই ছিটের মেধাবি শিক্ষার্থীকে বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হলে মিথ্যা পিতৃপরিচয় জোগাড় করতে হতো।

শুধু তাই নয়, সন্তানসম্ভবা বধূ নিকটতম হাসপাতালে গেলে ভর্তি নিত না। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, অন্তঃসত্ত্বা বধূরা কি হাসপাতালে যেত না? অবশ্যই যেত। কিন্তু যাওয়ার সে পথ সুগম ছিল না। হাসপাতালে ভর্তি হতে দেশহীন দেশের গৃহবধূকে অপরিচিত কোন পর পুরুষের বউয়ের পরিচয়ে ভর্তি হতে হত। যে পুরুষ মানুষটি হাসপাতালের দেশের স্বীকৃত নাগরিক।

শিশুর জন্মের পর হাসপাতাল থেকে যে কার্ড দেওয়া হত, তাতে সদ্যোজাত শিশুটির বাবা হিসাবে সেই পুরুষটির নামই থাকত।

সন্তানপ্রসবা নারীর স্বামীর পরিচয় কিংবা পরীক্ষার্থীর অভিভাবকের পরিচয় মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে বিক্রি হত। কোন মেয়েকে অপহরণকারীরা তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করলে, সে অভিযোগ নিকটতম পুলিশফাঁড়িতে নিত না। কারণ, দেশবিহীন ছিটের মেয়েকে ফাঁড়ির দেশ ঐ দেশের নাগরিক বলে মানত না। এমনকি, সীমান্তের প্রহরীদের কাছে নির্মমভাবে নির্যাতিত হওয়াও বাদ যায়নি ছিটমহলবাসীদের (৮ এপ্রিল ২০১৯, আনন্দবাজার পত্রিকা)। কতই আমানবিক, অভিশপ্ত ছিল তাদের জীবন যা ভাবলেই গা শিউরে উঠে।

প্রকৃতপক্ষে, ছিটমহলবাসী রাষ্ট্রের নির্বুদ্ধিতার ফল ভোগ করত বিনা দোষে। তাদের ছোট্ট অসহায় জীবনের উপর যেকোন মুহূর্তে ধেয়ে আসত চরম বিপর্যয়। তাই নাগরিকত্ব ও পতাকা-প্রতীকহীন এই মানুষগুলির কত শত আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, বঞ্চনা, নির্যাতন, নিষ্পেষণ, নিপীড়ন, মানবেতর জীবন- এসবকে নিত্যসঙ্গী করে ছিটমহলের জীবনপ্রবাহ বহমান ছিল দীর্ঘ ৬৮ বছর। এত কষ্টে ছিটমহলবাসী দীনাতিপাত করলেও তাদের নিয়ে কেউ ভাবেনি। সকলেই জমি চেয়েছিল, কিন্তু কেউ চায়নি এই অসহায় মানুষদের কষ্টের অবসান।

ছিটমহল বিনিময় সংক্রান্ত কোন আইন পাশ হলে স্বাভাবিকভাবেই ভারতের অংশটুকু বাংলাদেশ ব্যবহারের অধিকার পেয়ে যাবে এবং পাশাপাশি ভারতও বাংলাদেশের অংশটুকু পেয়ে যাবে। এখানেই বাধে বিপত্তি। কারন ছিটমহল বিনিময় চুক্তি পাশ হলে বাংলাদেশ ভরতের চেয়ে প্রায় ১০,০০০ একর জমি বেশি পাবে। যদিও ছিটমহল বিনিময় চুক্তির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল ছিটমহলবাসীর নাগরিক পরিচয় ও স্বাভাবিক জীবন। কিন্তু দু:খজনকভাবে জমির হিসাব এখানে মূখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ানোয় রাষ্ট্রপ্রধানরা সর্বদা চুপ থেকেছেন। কিন্তু চুপ থাকতে পারেননি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সুযোগ্য তনয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাই তো ১৯৭৪ সালে ভারত সফরকালীন বঙ্গবন্ধু ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দুই দেশের বিরাজমান সীমান্ত সংকট নিয়ে কথা বলেন। সেখানে তিনি রেডক্লিফের কার্যক্রমকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ছিটমহলবাসীদের দূর্বিষহ জীবন-চিত্র তুলে ধরেন।

১৯৭৪ সালের ১৬ মে দুজনের মাঝে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ‘৭৪ এর মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি’ নামে পরিচিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৩য় সংশোধনী জাতীয় সংসদে (২৩ নভেম্বর, ১৯৭৪) বাংলাদেশ সরকার মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি পাশ করলেও ভারত সরকার পাশ করেনি। দূর্ভাগ্যবশত, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর দুই

রাষ্ট্রের আর কোন সরকার প্রধানই ছিটমহল সমস্যা সমাধানে তেমন আন্তরিক ছিলেন না। তাই ‘৭৪ এর চুক্তির পর ছিটমহলবাসীর মনে যে কিঞ্চিৎ আশার আলো ফুটে উঠেছিল, অংকুরেই তা বিনষ্ট হয়ে যায়।

মানবতার মা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর চুক্তিটি বাস্তবায়নের প্রতি জোর দেন। এ ব্যাপারে ভারত সরকারের সাথে কয়েক দফায় আলোচনা করেন। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ আবার ক্ষমতায় এলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুনরায় এ সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা শুরু করেন।

২০১১ সালের হাসিনা- মনমোহন প্রটোকল স্বাক্ষর তার স্পষ্ট প্রমাণ। সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার ২০১৩ সালে এ সংক্রান্ত একটি বিল সংসদে উত্থাপন করে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি সংসদ সদস্যেদের বিরোধিতায় পাশ করা সম্ভব হয়নি তখন।

এরপরেও দমে যান নি অদম্য শেখ হাসিনা। অত্যন্ত বিচক্ষনতার সহিত ঠান্ডা মাথায় প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যে বিজেপির তীব্র বিরোধিতার কারনে ২০১৩ সালে এ বিল পাশ হয়নি, সেই বিজেপি নেতৃত্বাধীন মোদি ২০১৪ সালে ভারতে সরকার গঠন করলেও আশাহত হননি আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান। বরং দ্বিগুন উদ্যম নিয়ে দারুন কুটনৈতিক দক্ষতায় এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে মোদিকে রাজি করান। এরই ধারাবাহিকতায় বিজিবি নেতৃত্বাধীন মোদি সরকার সীমান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষে ৭ মে ২০১৫ সালে ভারতীয় সংসদের নিম্ন কক্ষ লোকসভায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার স্থল সীমান্ত চুক্তি সংক্রান্ত বিল ৩৩১-০ ভোটের ব্যবধানে সংবিধানের ১০০ তম সংশোধনীর মাধ্যমে পাশ হয়। এ চুক্তি কার্যকর হয় ৩১ জুলাই’ ২০১৫ সালের মধ্য রাত থেকে। এই চুক্তির মাহাত্ম বলে শেষ করা যাবে না। কেননা, এই চুক্তির মাধ্যমে ৩০২ বছর ধরে চলমান সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় এবং ছিটমহলে বসবাসকারী প্রায় অর্ধলক্ষ মানুষ ফিরে পায় নাগরিকত্ব।

৬৮ বছরের বন্দীজীবনের অবসান হয়, অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন পিছনে ফেলে ফিরে পায় আলোকিত জীবন। চুক্তি পরবর্তী বাংলাদেশের অংশের ছিটমহলের মানুষের মৌলিক ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিপুল অর্থ বরাদ্ধ দিয়ে রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ করেন। নির্মান করেন স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল। থাকার জন্য গৃহ নির্মান করে

দেন। মোদ্দাকথা, মানবেতর ও বদ্ধ জীবন থেকে এই মানুষগুলিকে মুক্তি দিয়ে নাগরিক মর্যাদা প্রদানপূর্বক সকল অধিকার নিশ্চিতের এক অনন্য নজির স্থাপন করলেন মমতাময়ী শেখ হাসিনা। তাঁর এ মহান উদ্যোগ সমহিমায় স্মরিত হবে যুগ থেকে যুগান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে। তাঁকে ছিটমহলবাসি কৃতজ্ঞতায় রাখবেন আজীবন।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগবরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা প্রসারে আওয়ামী লীগ সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও অর্জন

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। উপযুক্ত শিক্ষা মানুষের মেধা বিকশিত করার মাধ্যমে তাকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। তাই দেশে দেশে শিক্ষা সচেতন মানুষ শিক্ষার অধিকার আদায়ে সক্রিয়। এই সত্যটি উপলব্ধি করেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই শিক্ষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলনে তিনি কার্যকরী সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় শিক্ষায় পুঁজি বিনিয়োগ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা, দারিদ্র্যের কারণে মেধাবী শিক্ষর্থীরা যেন উচ্চশিক্ষা বিমুখ না হয় এরকম সুস্পষ্ট কিছু প্রস্তাব রেখেছিলেন।

পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর পরই শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পাকিস্তানি ধারা পরিত্যাগ করে বাঙালি জাতির বিকাশের উপযোগী একটি সুস্থ ধারার শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া একটি দেশের অস্তিত্ব টিকিয়ে

রাখা কঠিন। এজন্য শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং যুগোপযোগী কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করার লক্ষ্যে প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই শিক্ষা কমিশন গঠন এবং এর মাধ্যমে একটি প্রগতিশীল শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন।

বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেন, মাদ্রাসা এডুকেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭২ এবং প্রাইমারি এডুকেশন অ্যাক্ট ১৯৭৪ নামে দুটি আইন প্রণয়ন করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা, কারিগরি সব ক্ষেত্রেই আধুনিক ও মানসম্পন্ন শিক্ষার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

১৯৭৩ সালে উচ্চশিক্ষা প্রসারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন পেশা ও বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্তবুদ্ধির চর্চাকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সরকারই প্রতিরক্ষা খাতের চেয়ে শিক্ষা খাতে ৭% বরাদ্দ বেশি রেখেছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষা দিয়েই দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করে জাতিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০০৯ সালে ২য় বারের মতো ক্ষমতায় এসে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর নিমিত্তে আধুনিক সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের শিক্ষা কমিশনের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে অভিন্ন পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, শিশুদের মধ্যে গণতন্ত্র ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোর তাগিদে ২০১০ সাল থেকে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে স্টুডেন্ট কাউন্সিল নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিলো। এর ফলে শিক্ষায় শিশুর অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে এবং বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার পর্যায়ক্রমে কমে ৪৭.২৫% থেকে ১৩.৯৫% এ নেমে আসে।

কোভিড-১৯ চলাকালীন পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজেশনের আওতায় এনে অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ধারবাহিকতা বজায় রেখেছেন। প্রায় প্রতিটি স্কুলে আইসিটি ল্যাব চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে কম্পিউটার কোর্স বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনার লক্ষ্যে শিক্ষকদের আইসিটি ও পেডাগজি সমন্বয়ের প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণসহ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির

প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

২১ শতকের নানবিধ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং সম্ভাবনার পূর্ণ সুফল গ্রহণের জন্য অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা, ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক এবং যোগ্য বিশ্ব-নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে ।

দেশব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দক্ষ ও সৃষ্টিশীল মানব শক্তি তৈরিতে সর্বশক্তি নিয়োগ, উচ্চশিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য হাইয়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহেনসমেন্ট প্রজেক্ট গ্রহণ, অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। শুধু সাধরণ বা প্রযুক্তি শিক্ষা নয় শেখ হাসিনার সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মাদ্রাসা কাঠামোতে বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শাখা চালু করেছে। স্থাপিত হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর ও ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়। দাওরা হাদিসকে মাস্টার্স সমমান প্রদান করে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসারে বর্তমান সরকার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি কওমি মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থার সরকারি স্বীকৃতি কার্যকর করেছেন। অথচ ইতোপূর্বে কোনো সরকারকেই কওমি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তেমন গুরুত্ব দিতে দেখা যায়নি।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর পরিবারসহ নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর বিভিন্ন সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও শিক্ষা বিস্তারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেনি। অধিকন্তু তৎকালীন বিএনপি সরকার ১৯৮১ সালে সারা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বেসরকারিকরণ করার উদ্যোগ গ্রহন করে। যদিও শিক্ষকদের জোরদার আন্দোলনের ফলে বিএনপি সরকার তাদের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। অন্যদিকে ২০০৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৈষম্যের আন্দোলনে অনেক শিক্ষককে গ্রেফতার করে হাজতে পাঠানো হয়। কাজেই সবদিক বিবেচনায় একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনের অগ্রযাত্রা, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রসারে আওয়ামী লীগ সরকারের অবদান অনস্বীকার্য।

লেখক: চেয়ারম্যান, শিক্ষা বিভাগ ও ডিন, শিক্ষা বিজ্ঞান অনুষদ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রেসক্রিপশন নির্ভর বিএনপির রাজনীতি

‘তালগোল পাকানো’ শব্দটার প্রতিশব্দ হলো, মারাত্মক ভুল; মন্দভাবে পরিচালনা করা ইত্যাদি। এই ‘তালগোল পাকানো’ শব্দটা বর্তমান রাজনীতিতে সুনির্দিষ্ট করে বললে বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য। কীভাবে?

আপনি যদি রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বা রাজনীতি সচেতন মানুষ হন তবে গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন, বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতিতে প্রধান স্পোক পার্সন আসলে কে এটা খুঁজে পাওয়া যাব না। একেক সময় একেকজন আর্বিভূত হন। যখন কাউকে পাওয়া যায় না তখন অবতাররূপী কাউকে কাউকে দেখা যায়।

কে তাদের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে বা কে তাদের রাজনৈতিক নির্দেশনা দিচ্ছে? এইরকম একজন নয়, অসংখ্য লোক পাবেন। কেন অসংখ্য? কারণ তারা আসলে সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যে নিয়ে রাজনীতি করছে না। সময়ের সাথে সাথে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়। একেক সময় তারা একেক ধরনের দফা-রফা নিয়ে মাঠে নামে। সহজ করে বললে, তাদের রাজনীতি হলো ‘প্রেসক্রিপশনের রাজনীতি’।

ডাক্তার যেমন রোগী দেখে বিভিন্ন ওষুধ প্রেসক্রিপশনে লিখে দেন বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতিও বহুজনের প্রেসক্রিপশনে বা বহুজনের মতামতে বা বিদেশি নির্দেশ বা সুপারিশে চলছে।

বাংলায় দুইটি প্রবাদ বাক্য বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতির জন্য প্রণিধানযোগ্য। ‘নানা মুনির নানা মত’ ও ‘অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট’। এই অধিক সন্ন্যাসীরা কখনো বলছেন সংলাপ প্রয়োজন, কখনো বলছেন সংলাপ প্রয়োজন নেই বা বিএনপি সংলাপে যাবে না।

এরা কখনো বাইডেনের প্রতিনিধি ধরে আনে, কখনো বৈদেশিক শক্তির ভয় দেখায়, কখনো নির্বাচন বয়কট করার ঘোষণা দেয়, কখনো সরকার পতনের ঘোষণা দেয়, কখনো আবার ১১ দফা বা ১ দফার ঘোষণা দেয়। এতসব ঘোষণা বা কর্মসূচির ভিড়ে তাদের আসল লক্ষ্য কী তাই বোঝা যাচ্ছে

না।

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বিএনপি-জামায়াতের কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডায় জনগণের চাহিদা গুরুত্ব পায়নি। জনগণ যখন পণ্যের উচ্চমূল্য নিয়ে প্রতিবাদ করছে তখন তাদের কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই, নেই আন্দোলন, নেই বিক্ষোভ। তখনো তারা সরকার পতন নিয়ে ব্যস্ত। সরকার পতন অবশ্যই তাদের আন্দোলনে থাকবে কিন্তু তার সাথে সাথে জনগণের চাহিদা কেন তাদের মাথায় থাকবে না তা আমরা বুঝি না। এর মূল কারণ হলো, বিএনপি-জামায়াতের আন্দোলনের এই প্রেসক্রিপশন তাদের নিজেদের নয়। অন্য কোনো শক্তির বলে দেওয়া আন্দোলন বা এজেন্ডা। মূল কারণ হলো, ‘নানা মুনির নানা মত’ ও ‘অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট’।

একদিকে যেমন নেতৃত্ব শূন্যতা অপরদিকে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারাও বিভিন্নজনের ‘প্রেসক্রিপশন’ শুনে মূল বিষয় বলতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন।

যখন নিজেদের লক্ষ্য স্থির থাকে না তখন বাইরের কেউ এসে তার মতো করে লক্ষ্য স্থির করে দেয়। যেমন মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বিএনপির গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং দলের ভাইস চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, ‘বিএনপির ভোটে অংশ নেওয়া উচিত। বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিলে আমি এই দল থেকেই নির্বাচন করব।’ অথচ এই কথাটা বিএনপির বাকি নেতাদের মুখে নেই। তারা একেকসময় একেক কথা বলছেন। বিএনপির সামগ্রিক অস্থিরতা এখন দলের বিভাজন রেখা বড় করে দিয়েছে।

তৃণমূল বিএনপির চেয়ারপার্সন শমসের মুবিন চৌধুরী বলেন, তৃণমূল বিএনপি দলীয় নিয়ম নীতি মেনে পরিচালিত হবে। প্রাইভেট কোম্পানি হবে না। তৃণমূল বিএনপি হবে বাংলাদেশের তৃণমূল কংগ্রেস। আমরা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব। তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার বলেছেন, নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার আশ্বাস পেলে তারা নির্বাচনে অংশ নেবেন। ৩০০ আসনে প্রার্থী দেবেন।

অনেকেই ধারণা করছেন, একাধিক রাজনৈতিক মতবাদের কারণে তাদের এই বিভাজন। আরও বিস্ময়কর হলো, ২৮ তারিখ থেকে হরতাল, অবরোধের কর্মসূচির ঘোষণা এসেছে বিএনপি থেকে। তাদের সিনিয়র নেতার এই কর্মসূচি দিয়েছেন। এখন দিচ্ছে গণতন্ত্রর মঞ্চ আর জামায়াত।

সরকারের পদত্যাগ ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে ক্ষমতা

হস্তান্তর করে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ও বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামসহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে আগামী ১২ ও ১৩ নভেম্বর সারা দেশে চতুর্থ দফায় (৪৮ ঘণ্টা) সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ।

রোববার (১২ নভেম্বর) ও সোমবার (১৩ নভেম্বর) আবারো টানা ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। সরকারের পদত্যাগ, নির্বাচনকালীন কেয়ারটেকার সরকার গঠন, আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমানসহ সকল রাজবন্দি এবং ওলামা-মাশায়েখের মুক্তি, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার দাবিতে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে দলটি।

এরা কিন্তু একসাথে রাজনীতি করে, অথচ তারা একেক উদ্দেশ্য নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে অবরোধ ডাকছে। বিষয়টা কি এখন পরিষ্কার যে, যে দলের কাছে যে ধরনের প্রেসক্রিপশন আসছে তারা সেইভাবে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য নিয়ে কর্মসূচি দিচ্ছে।

তাদের জোটবদ্ধ হয়ে লক্ষ্যে ফিরতে হবে। ক্লোজআপ ওয়ানের সেই গানের মতো—যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে, হবেই হবে দেখা, দেখা হবে বিজয়ে। বিএনপি-জামায়াতের উচিত বিভিন্নজনের প্রেসক্রিপশন বাদ দিয়ে জনগণকে সাথে নিয়ে রাজনীতি করা।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

লড়াই, সংগ্রাম, সাফল্য ও উন্নয়নের পথিকৃৎ শেখ হাসিনা

লড়াই, সংগ্রাম, সাফল্য ও উন্নয়নের নাম শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে গড়া দলটি যখন যোগ্য নেতৃত্বের সংকটে, ঠিক সেই সময় দলের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে আবির্ভাব হয় শেখ হাসিনার। ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। নির্বাচিত হওয়ার সাড়ে তিন মাসের

মাথায় ওই সময়কার সরকারের রক্তচক্ষু ও নানা বাধা উপেক্ষা করে দীর্ঘ ৬ বছরের নির্বাসিত জীবন শেষ করে ১৭ মে দেশে ফেরেন তিনি।

বাবা-মায়ের স্নেহের যে বাড়িতে বড় হয়েছেন, সেই ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের সেই বাড়িতে, প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয় শেখ হাসিনার কণ্টকাকীর্ণ পথ চলা। শুরু করেন দেশের গণতন্ত্র এবং জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার নিশ্চিতের সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামের পথে তাকে পার হতে হয় নানা প্রতিবন্ধকতা। কারাবরণ করতে হয় একাধিকবার। অদ্যাবধি তাঁকে হত্যার জন্য ২০বার সশস্ত্র হামলা করা হয়। অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বারবার মৃত্যুর মুখে পড়েছেন তিনি। তবুও পিছপা হননি, লড়াই সংগ্রাম ছেড়ে দেননি শেখ হাসিনা। শত বাধা-বিপত্তি, জেল-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন এবং হত্যার হুমকিসহ কোন কিছুই তাকে টলাতে পারেনি একবিন্দুও। বরং সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেছেন সামনের দিকে।

২০০৬ সালে বিএনপি-জামায়াত সরকারের মেয়াদ শেষ হলেও নানা রকমের টাল-বাহানা করে ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নতুন ভোটার তালিকায় ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার অন্তর্ভুক্ত করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার ষড়যন্ত্রও করেছিল তারা। দলীয় রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকেই প্রধান উপদেষ্টার পদ দিয়ে হাস্যকর এক তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে ৬ জানুয়ারি নির্বাচনের নামে প্রহসন আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সচেতন দেশবাসী এসব অনিয়ম ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অপকৌশলকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। সে সময় বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় সংকট ও অরাজক পরিস্থিতিতে সেনা সমর্থিত আরেক নতুন ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু তারাও নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান না করে ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করাসহ নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়।

বিলম্বে হলেও তারা পূর্বোক্ত ভোটার তালিকা সংশোধন ও ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা তৈরির মাধ্যমে একটি সর্বজনগ্রাহ্য নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। সেই ২০০৮ সালের নির্বাচনে “দিন বদলের সনদ”-রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন শিরোনামে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ভূমিধস বিজয় অর্জন করে।
এরপর ২০১৪ সালে “এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ” স্লোগানে সরকার গঠন করে ১০টি মেগা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেন। ২০৪১ সালের উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং ২১০০ সালে “নিরাপদ ব-দ্বীপ” প্রণয়নের রূপরেখা

প্রদান করে ২০১৮ সালে “সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ” শিরোনামে আবারও সরকার গঠন করে। ফলস্বরূপ আজ অবধি দেশের মানুষ জননেত্রী শেখ হাসিনার ওপর আস্থা রেখেছে বলেই দেশের বিভিন্ন খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে ধারাবাহিক উন্নয়নের প্রতিফলন দৃশ্যমান হচ্ছে এবং দেশের মানুষ এর সুফল ভোগ করছে।

আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে শেখ হাসিনা সরকার বিভিন্ন মেগা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে চলেছে এবং যোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক উন্নয়ন হয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক ও রেলযোগাযোগ স্থাপনের জন্য পদ্মাসেতু, বঙ্গবন্ধু যমুনাসেতু, তিস্তাসেতু, পায়রাসেতু, দ্বিতীয় কাঁচপুরসেতু, দ্বিতীয় মেঘনা ও গোমতী সেতুসহ শত শত সেতু, সড়ক, মহাসড়ক নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ করেছে সরকার। এছাড়া ঢাকায় হানিফ ফ্লাইওভার, তেজগাঁও-মগবাজার-মালিবাগ ফ্লাইওয়ার, কমলাপুর-শাহজাহানপুর ফ্লাইওভার, বনানী ফ্লাইওভার, টঙ্গীতে আহসানউল্লাহ মাস্টার ফ্লাইওভার, চট্টগ্রামে আক্তারুজ্জামান চৌধুরী ফ্লাইওভার ও বদ্দারহাট ফ্লাইওভারসহ বহুসংখ্যক ছোট-বড় ফ্লাইওভার নির্মাণ করে যাচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ শেখ হাসিনার হাত ধরেই নতুন যুগে প্রবেশ করেছে, স্থান করে নিয়েছে স্যাটেলাইট বিশ্বে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ মহাকাশে উৎক্ষেপন করেছে কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপনেরও প্রস্তুতি চলছে। গভীর সমুদ্রের তলদেশে অপটিক্যাল ফাইবার নির্মাণ এবং মহাকাশে স্যাটেলাইট স্থাপনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা সহজতর হয়েছে।
দেশে বর্তমানে প্রায় ১৮ কোটির বেশি মোবাইল ফোন ব্যবহার হচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১১ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। একসময় দেশের টিভি চ্যানেল গুলো স্যাটেলাইট ভাড়া বাবদ বছরে ১ কোটি ৪০ লাখ ডলার ব্যয় করত। সে টাকা এখন থেকে দেশেই থেকে যাবে।
বাংলাদেশ বেতারসহ দেশের সবক’টি টেলিভিশন চ্যানেল এবং দেশের একমাত্র ডিটিএইচ অপারেটর ‘আকাশ’ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সেবা নিচ্ছে। এ ছাড়াও দেশের ৩১টি দুর্গম ও প্রত্যন্ত দ্বীপাঞ্চলের ১১২টি স্থানে টেলি যোগাযোগ ও ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের অনেক স্বনামধন্য ব্যাংক, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সশস্ত্রবাহিনী বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ব্যবহার করে তাদের সেবা দেওয়া শুরু করেছে। ফলে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু, উপজেলা শহরে ব্যাংকের এটিএম বুথ নির্মাণসহ

সহজলভ্য ইন্টারনেট সেবা এখন মানুষের দোরগোড়ায়।

শুধু দেশি সংস্থা নয়, বাংলাদেশের পাশাপাশি বিশ্বের আরো কয়েকটি দেশের বিভিন্ন টিভি চ্যানেল বর্তমানে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট থেকে ট্রান্সপন্ডার ভাড়া নিয়ে ব্যবহার করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশ গুলো হচ্ছে হন্ডুরাস, তুরস্ক, ফিলিপাইন, ক্যামেরুন ও দক্ষিণ আফ্রিকা। সরকার প্রধান শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার ফলশ্রুতিতেই এ সব কিছু বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক মন্দা, করোনা মহামারি ও ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী সংকট সৃষ্টি করলেও জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ‘সতর্ক’ অবস্থানে থেকে এবং অনেক ক্ষেত্রে ‘কৃচ্ছতা’ অবলম্বনের মাধ্যমে সে সংকট এখন পর্যন্ত সফলভাবে মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জন করেছে।

দেশের অর্থনীতি এখনো বেগবান রয়েছে। ২০৩৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার বিশ্বের ২০তম অবস্থান অর্জন করবে বলেও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণায় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। অথচ বিএনপি-জামায়াতসহ একদল ষড়যন্ত্রকারী বাংলাদেশকে বরাবরের মতো পিছিয়ে নেবার যারপরনাই চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাদের বিরতিহীন অপতৎপরতা, সব ষড়যন্ত্রকারী এবং “নিন্দুকের মুখে ছাই” দিয়েই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে।
তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ এখন বিশ্বে একটি উন্নয়নের রোলমডেল। এর পুরোটাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কৃতিত্ব। তার এই অনন্য কৃতিত্বে গর্বিত বাংলাদেশ, গর্বিত বাঙালি জাতি। দেশবাসীর উচিত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবায়নকে উপলব্ধি করা এবং সে মতে কার্যক্রম গ্রহণ করা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচন এলেই বিএনপিসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলো জনগণকে আকৃষ্ট করতে অনেক প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি দিয়ে থাকে। অতীতে দেখা গেছে, আওয়ামী লীগ ছাড়া বিএনপি-জাতীয় পার্টি বা অন্যান্য দল যারা বৈধ-অবৈধভাবে ক্ষমতায় এসেছে, তারা জনগণকে দেয়া অঙ্গীকারের ৩০ ভাগও বাস্তবায়ন করেনি। এমনকি প্রতিশ্রুতি পূরণে তেমন কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম একমাত্র শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ, নির্বাচনের আগে যেসকল প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা ক্ষমতায় এসেছে, তার শতভাগ পূরণ করার চেষ্টা করেছে এবং জনগণের আস্থা-বিশ্বাস আরও দৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে।

সরকার প্রধান শেখ হাসিনাও চলমান মেয়াদে চতুর্থ বছর পূর্তিতে

জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেছেন, “এই ১৪ বছরে আমরা দেশ এবং দেশের জনগণকে কী দিতে পেরেছি- তার বিচার-বিশ্লেষণ আপনারা করবেন”। তিনি আরও বলেন, “রূপকল্প ২০২১-এর পর আমরা রূপকল্প ২০৪১ এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করেছি। রূপকল্প ২০২১-এ আমরা অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলাম। আজ সন্তুষ্টচিত্তে বলতে পারি, আমরা সে প্রতিশ্রুতি পূরণে সক্ষম হয়েছি”। আর এই বিশাল সফলতা ও বদলে দেয়া দেশের অর্জনগুলো সামনে রেখেই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আগামী দ্বাদশ নির্বাচনে “স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ”-এর প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে।

এরইমধ্যে প্রধানমন্ত্রী এ নিয়ে বিশদ বিবরণও দিয়েছেন। এ কথা আজ সর্বাংশে সত্য যে, শেখ হাসিনা তার সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন।
বাংলার মানুষ বিশ্বাস করে একমাত্র শেখ হাসিনাই পারবেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সুখী, সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলা গড়তে। এজন্য শেখ হাসিনার হাতকে আরো শক্তিশালী করা দরকার। বিগত সময়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও সাফল্য অর্জন করছে, সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে আমাদের সকলের উচিত সরকারকে সকল কর্মকাণ্ডে সহায়তা ও আকুণ্ঠ সমর্থন অব্যাহত রাখা।

লেখক: প্রক্টর, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও অপরাজনীতি

স্বাধীন বাংলাদেশে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও অপরাজনীতির সূচনা হয়েছিলো ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। ইতিহাসের নৃশংসতম এই ঘটনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের দুই সদস্য শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ছাড়া বাকি সবাইকে হত্যা করা হয়। পরিবার ও পরিবারের বাইরের সদস্য মিলে মোট আঠারো জনকে হত্যা করা হয় এই দিনে, প্রায় একই সময়ে।

হত্যাকাণ্ডের পরপরই খুনিচক্র ‘বাংলাদেশ বেতার’ দখল করে। নাম পাল্টে রাখে ‘রেডিও বাংলাদেশ’। আত্মস্বীকৃত খুনিদের অন্যতম মেজর ডালিম বেতার ভাষণে বলেন – “অদ্য সকাল হতে খন্দকার মোশতাক আহমেদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করিয়াছে। শেখ মুজিব ও তাঁর খুনি-দুর্নীতিবাজ সরকারকে উৎখাত করা হইয়াছে। এখন হইতে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হইলো। আপনারা সবাই আমাদের সহিত সহযোগিতা করুন। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন কোনো অসুবিধা আপনাদের হইবে না। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।”

বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক বেতার ভাষণে বলেন – “এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আজ দেশ এবং দেশবাসীর বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা ও দেশবাসীর উপর নির্ভর করে দেশের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নয়া সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। দেশের দেশপ্রেমিক সামরিক বাহিনী এই পদক্ষেপের সাফল্যের জন্য বীরের মতন এগিয়ে এসেছে।”

২৫ আগস্টে মেজর জেনারেল কেএম শফিউল্লাহকে অপসারণ করে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং সারাদেশে সামরিক বিধি জারি করে বেশ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত গঠন করা হয়। মুখে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বললেও দেশে চলে সামরিক শাসনের তুগলকি কাণ্ড। ৩০ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে এক সরকারি আদেশে সব রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে সেই প্রথম রাজনীতি করার স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়। শুরু হয় অপরাজনীতির ধারা। খন্দকার মোশতাক তার অবৈধ মন্ত্রিসভায় আরও অনেককে ভয়ভীতির মুখে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলেও চার জাতীয় নেতা, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এইচএম কামরুজ্জামানকে বশে আনতে না পেরে কারাবন্দি করে।

এরপর ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ তারিখে জারি করা হয় কুখ্যাত ‘ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স’। অবৈধ রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাকের এই অধ্যাদেশের মূল উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের রক্ষা করা। অধ্যাদেশের প্রথম অংশে বলা হয় – ‘১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে বিদ্যমান আইনের পরিপন্থী যাহা কিছুই ঘটুক না কেন, এ ব্যপারে সুপ্রিম কোর্টসহ কোনো আদালতে মামলা, অভিযোগ দায়ের করা বা কোনো আইনি প্রক্রিয়ায় যাওয়া যাবে না।’ অধ্যাদেশের দ্বিতীয় অংশে বলা হয় – ‘রাষ্ট্রপতি উল্লিখিত ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে যাদের প্রত্যয়ন করবেন তাঁদের দায়মুক্তি দেয়া হলো।’

চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতির চড়াই উতরাইয়ের উত্তাল সময়ের মধ্যে ০৩ নভম্বেরের শেষরাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সকল নিয়মনীতি ভঙ্গ করে খুনির দল কারাগারে প্রবেশ করে এবং জাতীয় চার নেতাকে ব্রাশ ফায়ারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই রাতেই বাংলাদেশ বিমানের বিশেষ ফ্লাইটে খুনিচক্রকে ব্যাংকক পাঠিয়ে দেয়া হয়। খন্দকার মোশতাকের উপর বিদেশি প্রভু এবং দেশি ষড়যন্ত্রকারীদের ন্যস্ত দায়িত্ব ছিলো এই পর্যন্তই।
নীল নকশা অনুযায়ী ৬ নভেম্বর ১৯৭৫ এ সামরিক আইনের বিধি সংশোধন করে সুপ্রিমকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের নিকট মোশতাক ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ওই দিন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণের পর প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম বেতারে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে বলেছিলেন, ‘… গত ১৫ আগস্ট কতিপয় অবসরপ্রাপ্ত এবং চাকরিচ্যুত সামরিক অফিসার এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের হত্যা করে। খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সামরিক আইন জারি করেন। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার সঙ্গে সামরিক বাহিনী সংশ্লিষ্ট ছিল না। দেশবাসী আশা করেছিল, দেশে আইনশৃঙ্খলা ফিরে আসবে, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু আমরা সবাই নিরাশ হয়েছি। দেশে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমনকি সম্প্রতি কারাগারে অন্তরীণ কিছু বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। …দেশে সামরিক আইন জারি রয়েছে। আমি একটি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় অন্তর্র্বতীকালীন সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং ন্যূনতম সময়ের মধ্যে অবাধ নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। আমরা এই দায়িত্ব ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, অথবা সম্ভব হলে তার পূর্বেই পালন করতে বদ্ধপরিকর।’

৭ নভেম্বর ১৯৭৫ তারিখে জিয়াউর রহমান বন্দিদশা (খালেদ মোশাররফ কর্তৃক) থেকে কর্নেল তাহেরের আনুকূল্যে মুক্তিলাভ করেন। মুক্ত হয়েই জিয়া দ্রুত দেশি-বিদেশি শক্তির সঙ্গে সমঝোতা করে কর্নেল তাহের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন এবং ক্ষমতার মূল কেন্দ্রের কর্তৃত্ব নিয়ে নেন। যে কারণে প্রেসিডেন্ট সায়েম জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া দ্বিতীয় ভাষণ দিতে বাধ্য হন। এ ভাষণে তিনি বলেন, ‘… পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনার জন্য আমরা কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে দেশে সামরিক আইন প্রশাসন কাঠামো গঠন করা হয়েছে। এই কাঠামোতে রাষ্ট্রপতি স্বয়ং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হবেন। এতে তিনজন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থাকবেন। তাঁরা হচ্ছেন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান কমোডর মোশাররফ হোসেন খান এবং বিমানবাহিনী প্রধান এমজি তাওয়াব।‘ প্রিয় পাঠক, লক্ষ্য করবেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দুজন রাষ্ট্রপতিই বেসামরিক হলেও তারাই হলেন প্রধান সামরিক শাসক!

৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৫এ দালাল আইন বাতিল করে দেয়া হয়। এতে সমস্ত যুদ্ধাপরাধীদের কারাগার এবং অভিযোগ থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়। শহীদদের রক্তস্নাত বাংলাদেশে বুক ফুলিয়ে চলতে শুরু করে রাজাকার, আলবদর, আল শামস্ বাহিনীর সদস্যরা। ৩ মে ১৯৭৬ তারিখে সরকারি এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সংবিধানের ৩৮নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিল করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। যে কারণে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, পিডিপি, নেজামে ইসলামসহ অপরাপর ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহ আবার তাদের তৎপরতা শুরু করে। রাষ্ট্র-সমাজ আর রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হয় যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে জড়িত রাজাকার, আলবদর, আল শামস্ বাহিনীর সদস্যরা।

১৭ জুলাই ১৯৭৬ এ এক বিশেষ সামরিক আদালতে ‘সরকার উৎখাত ও সেনাবাহিনীকে বিনাশ করার চেষ্টা চালানোর’- অভিযোগে জাসদনেতা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল তাহেরকে মৃত্যুদণ্ড এবং এমএ জলিল, আ.স.ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, হাসানুল হক ইনু, তাত্ত্বিক নেতা সিরাজুল আলম খান সহ আরও অনেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি দেয়া হয়। ২১ জুলাই ১৯৭৬ তারিখে আন্তর্জাতিক সকল আইনকানুন লঙ্ঘন করে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

২৮ জুলাই ১৯৭৬ তারিখে বিচারপতি সায়েমের সামরিক সরকার রাজনৈতিক দলবিধি জারি করে। আওয়ামী লীগ তাদের সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন আহমদকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং মহিলাবিষয়ক সম্পাদিকা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে। খুনি খন্দকার মোশতাকের নবগঠিত ডেমোক্র্যাটিক লীগ এবং স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকারি অনুমোদন পেলেও আওয়ামী লীগ নিয়ে টালবাহানা শুরু হয়। আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত ‘বঙ্গবন্ধু’ শব্দটি বাদ দেয়ার জন্য পত্র

দেয়া হয়।

শেষ পর্যন্ত বিচারপতি সায়েমের সরকার ১৯৭৬ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক দল হিসেবে অনুমোদন দেয়। বিএনপির নেতৃবৃন্দ প্রায়ই বলে থাকেন, জেনারেল জিয়া বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা এবং আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক দল করার অনুমতি দাতা। এ কথাটি সর্বৈব মিথ্যা। কারণ, সে সময় রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ছিলেন বিচারপতি সায়েম।

১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর, সেনাপ্রধান ও উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদ গ্রহণ করেন। গ্রেফতার করা হয় আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মালেক উকিল, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাজেদা চৌধুরী, আবদুল মোমেন তালুকদার, সালাউদ্দিন ইউসুফ, মোজাফফর হোসেন পল্টু, রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া এবং ন্যাপ নেতা মতিয়া চৌধুরীসহ আরও অনেককে।

লন্ডনের বিখ্যাত ‘গার্ডিয়ান’ পত্রিকায় বলা হয়, ‘প্রশাসন ক্ষেত্রে সায়েমের (প্রেসিডেন্ট) কোন ভূমিকা ছিল না এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শও করা হতো না। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তিনি পীড়াপীড়ি করছিলেন এবং শাসনক্ষমতা থেকে সামরিক বাহিনীকে বিদায় দেয়ার জন্য তিনি ঘরোয়াভাবে শলা-পরামর্শ শুরু করেছিলেন। এখন তাঁকে ছুড়ে ফেলে দেয়া হবে। সায়েমকে অসামরিক প্রেসিডেন্ট হিসেবে এতদিন রাখা হয়েছিল জিয়ার সামরিক শাসনের চেহারা ঢেকে রাখার জন্য।’

১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল বিচারপতি সায়েম পদত্যাগে বাধ্য হন এবং জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রপতি হন। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া প্রসঙ্গে বিচারপতি সায়েম বলেন ‘যেহেতু জিয়া প্রেসিডেন্ট হতে চেয়েছেন, এবং আমার মনে হয়েছে যে, উপদেষ্টা কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যই তাঁকে সমর্থন করেছেন, তাই আমি তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করি যে তিনি নিজে কোন হুমকির সম্মুখীন না হয়ে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বাবলী সামলাতে পারবেন কি না’ তিনি হ্যাঁ সূচক জবাব দেন। … প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার আগ মুহূর্তে আমি জিয়াকে বলি, আমি যেহেতু নির্বাচন করে যেতে পারলাম না, তাই আপনার প্রতি অনুরোধ করবো নির্বাচন আয়োজনের। তিনি আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, তিনি নির্বাচন করবেন। শুনে আমি খুশি হই। কিন্তু আমি তখন বুঝতে পারিনি যে, নির্বাচনে তিনি নিজেই অংশ নেবেন। সেরকম ক্ষেত্রে সেনাপ্রধান থাকা অবস্থাতেই এবং সামরিক আইনের অধীনে

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবেও, অর্থাৎ ক্ষমতাসীন হয়েই তিনি নির্বাচন করবেন এবং সেই নির্বাচনে নিজে অংশগ্রহণ করবেন এমন চিন্তা তখন আমার মাথায় আসেনি।’

রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং একই সঙ্গে সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল জিয়া জিয়াউর রহমান তার ওপর জনগণের আস্থা আছে কি না তা যাচাইয়ের জন্য ৩০ মে ১৯৭৭ দেশব্যাপী গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। সে সময় দেশে ভোটারের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৮৩ লাখ ৬৩ হাজার ৮৫৬ জন। অবিশ্বাস্যভাবে সরকারি ঘোষণায় বলা হয় ৮৮.৫% ভোটার গণভোটে অংশ নিয়েছেন এবং জিয়াউর রহমানের পক্ষে ‘হ্যাঁ’ সূচক ভোট পড়েছে ৯৮.৮৮%। এ নির্বাচন প্রসঙ্গে বিচারপতি সায়েম বলেন – “বস্তুত জিয়া তাঁর অবস্থান সংহত করার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে একটা গণভোট করে ফেলেন। তাঁর প্রতি এবং তাঁর ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচীর প্রতি ভোটারদের আস্থা আছে কি না তাই ছিল গণভোটের বিষয়। কিন্তু সেই গণভোটে হ্যাঁ বাক্সে এত বেশি ভোট পড়ে যে, জনগণ সেই ফলাফলকে হাস্যকরভাবে অবিশ্বাস্য মনে করে।” আওয়ামী লীগ এবং জাসদ ‘হ্যাঁ-না’ ভোট বর্জন করে।

১৯৭৮ সালের ৫ এপ্রিল জেনারেল জিয়ার সরকার বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে এক অধ্যাদেশ জারি করে। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে স্বাধীনতা বিরোধীদের এবং বিদেশে পালিয়ে থাকা আলবদর-রাজাকারদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ২৮ এপ্রিল ১৯৭৮ জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকার একটি নতুন অধ্যাদেশ জারি করে। এতে বলা হয়, সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে একমাত্র সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবেন এবং রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন।

বন্দুকের জোরে গণতন্ত্রের নামে ক্ষমতার অপব্যবহারের এ ধরনের নজির সারা বিশ্বে বিরল। ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে জিয়া নতুন রাজনৈতিক দল ‘বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল’ সংক্ষেপে বিএনপি গঠন করেন। একই সঙ্গে দলের চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করেন। তখনো দেশে কোনো সাধারণ নির্বাচন হয়নি বা জিয়া সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করেনি।

১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৮ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়া এক ফরমান জারি করে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এনে প্রেসিডেন্টের হাতে প্রায় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেন। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর নির্বাচনী প্রচারের স্বল্প সুযোগ

দিয়ে ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৯ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়। আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলসমূহ আপত্তি জানায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন এক ঘোষণায় ২৭ জানুয়ারির পরিবর্তে ১৮ ফেব্রূয়ারি ১৯৭৯ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পুনঃতফসিল ঘোষণা করে।

সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ায় এবং নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেয়ায় বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। শুরু থেকেই নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় থাকলেও সামরিক সরকারের মুখোশ উন্মোচন এবং আন্দোলনের অংশ হিসেবেই আওয়ামী লীগসহ অপরাপর রাজনৈতিক দলসমূহ এ নির্বাচনে অংশ নেয়। ক্ষমতাসীন জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন নবগঠিত বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভ করে।

অপরাজনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা পাকাপোক্ত করার পর ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিলে সংসদের প্রথম অধিবেশনেই জারি করা হয় কুখ্যাত ‘ইনডেমনিটি এক্ট’ । এটি মোশতাকের ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্সের চেয়ে আরও ভয়াবহ, আরও অনেক বেশি নির্মম। এই আইনে বলা হলো – “১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের (উভয় দিনসহ) মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, ফরমান আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আদেশ, কাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ ১) এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইলো, ২) ওই সকল আদেশ, কাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ এতদ্বারা বৈধভাবে প্রণীত, কৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল, এবং ৩) তৎসম্পর্কে কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো কারণেই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।“

এই আইনের অর্থ দাঁড়ালো এরকম – ‘৭৫ এর ১৫ আগস্টে সংঘটিত বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশু রাসেল সহ ১৮ জনের হত্যা বৈধতা পেলো এবং বলে দেয়া হলো কোথাও এর কোনো বিচার চাওয়া যাবে না’ ১৯৭৫ এর ০৩ নভেম্বরে জাতীয় চার নেতার জেল হত্যা বৈধতা পেলো এবং বলে দেয়া হলো কোথাও এর কোনো বিচার চাওয়া যাবে না, ‘৭৫ এর ৩১ ডিসেম্বরে বাতিলকৃত দালাল আইন বাতিলই থাকবে, ফিরিয়ে আনা যাবে না, ১৯৭৬ সালের ০৩ মে এ সংবিধানের ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিল করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করার সুযোগ করে দেয়ার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না, খুনিচক্রকে বিদেশে পাঠানো এবং বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দেয়ার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না।

খালেদ মোশাররফ হত্যার বিচার, কর্নেল তাহের হত্যার বিচার, সেনা

ক্যুতে নিহত হাজার হাজার সামরিক সদস্যদের বিচার বহির্ভূত হত্যার বিচার – কোনো কিছুর ব্যপারেই বিচার চাওয়াতো দূরের কথা, মামলা পর্যন্ত করা যাবে না, ‘৭৭ এর প্রহসনের হাঁ – না গণভোটকে বৈধতা দেয়া হলো’ সবচেয়ে বড় কথা – অসাংবিধানিক উপায়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়াকে বৈধতা দেয়া হলো! জিয়াউর রহমানের এই ইনডেমনিটি আইনের চেয়ে বড় ‘রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের’ উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতির বীজ বপন করা হয়েছিলো ১৯৭৯ সালের এই ইনডেমনিটি আইনের মাধ্যমেই – যার খেসারত আমরা আজও দিয়ে চলছি।

লেখক: উপ-উপাচার্য, বুয়েট।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হরতাল-অবরোধের ক্ষতি

গুজরাটি শব্দ ‘হর’ মানে সব জায়গায় আর ‘তাল’ মানে তালা। অর্থাৎ হরতাল মানে সব জায়গায় তালা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকবৃন্দের মতে হরতাল হচ্ছে – গাড়ির চাকা ঘুরবে না এবং অফিস-আদালতসহ সব ধরনের প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। এক কথায় সব কিছু অচল করে দেওয়ার কর্মসূচি হচ্ছে হরতাল।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হরতালের প্রবর্তন করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে বাংলাদেশে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ‘তমুদ্দিন মজলিস’ প্রথম হরতাল ডাকার পর থেকে এ দেশের রাজনীতিতে হরতাল কর্মসূচিটি প্রচলিত হয়।

অন্যদিকে অবরোধ কর্মসূচি হচ্ছে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সবকিছু খোলা রেখে যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। গ্রিক উপাখ্যানে ইলিয়াড ও ওডেসিতে ট্রয় নগরী অবরোধের কথা আছে। ১১৮৭ সালে সালাউদ্দিন আইয়ুবি জেরুজালেম অবরোধ করেন।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে বিএনপি-জামাতসহ কয়েকটি বিরোধী দল হরতাল-অবরোধকে একই ধরণের কর্মসূচী বিবেচনা করে ধ্বংসাত্মক

কর্মকাণ্ড যুক্ত করে আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে দাবি আদায়ের চেষ্টা করছে। তারা হরতাল ও অবরোধে অগ্নিসংযোগ করে জালাও-পোড়াও করছে এবং সব ধরনের সরবরাহ চেইন বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাধাগ্রস্ত করে জনদূর্ভোগ বৃদ্ধি করছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হরতাল ও অবরোধে ক্ষতির বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

কৃষি উৎপাদন ব্যাহত: সরবরাহ চেইন বিচ্ছিন্ন হওয়ায় কৃষি উপকরণ যেমন সার, বালাইনাশক, বীজ, গ্রোথ রেগুলেটর, সেচ কাজের জন্য ডিজেল ইত্যাদি স্থানীয় বাজারে পৌছাতে পারছে না, ফলে কৃষক এগুলো সংগ্রহ করতে পারছে না। আবার কম সরবরাহের কারণে এগুলোর দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য শহরের বাজারে পাঠাতে পারছে না। সার্বিকভাবে কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি: অবরোধের কারণে সব ধরনের সরবরাহ চেইন বিচ্ছিন্ন হওয়ায় গত কয়েকদিনে কৃষি পণ্য বাজারে আসতে পারছে না। ফলে কৃষি পণ্যসহ অন্যান্য যাবতীয় ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়ছে। হরতাল-অবরোধের ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

দেশে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে আলু, পেঁয়াজ, চিনি, সয়াবিন তেল ও ডিমের দাম বেঁধে দেয়্। সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম বাজারে কার্যকর না হওয়ার পেছনে সরবরাহ ঘাটতিই দায়ী। সরবরাহ যদি ঠিক থাকত, তা হলে বাজারে নিত্যপণ্যের দাম কমে যেত। সরবরাহ সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম কার্যকর করা যাচ্ছে না।

শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত: হরতাল-অবরোধের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অচলাবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। নভেম্বর মাসে বিদ্যালয়সমূহে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বার্ষিক পরীক্ষা আয়োজন করতে হিমসিম খাচ্ছে। অবরোধের সংগে জালাও-পোড়াও ও অগ্নি সংযোগের অপরাজনীতি যুক্ত হওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্র, অভিবাবক সকলেই উদ্বিগ্ন। ঝুকি নিয়ে যাতায়াত করলেও তাদের যাতায়াত খরচ বহুগুনে বাড়ছে।

স্বল্প আয়ের মানুষের জীবিকা ব্যাহত: হরতাল-অবরোধে রিকসা-ভ্যান ও অটোরিকসা চালক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দিনমজুরগণ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। অটোরিকসা চালককে মালিকের দৈনিক ভাড়া

পরিশোধ করতে হচ্ছে, কিন্তু তারা পাচ্ছে না যাত্রী। শ্রমিকরা পাচ্ছে না কাজ। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা টিকে থাকতে পারছে না। সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওযায় তাদের ত্রাহিত্রাহি অবস্থা।

ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত: জনগণ ও অর্থনীতিকে জিম্মি করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার লক্ষ্যে সরকার-বিরোধী দলসমূহের ডাকা অবরোধের সংগে অগ্নি-সন্ত্রাসের ভয়ে ব্যবসায়ীগণ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিকমতো চালাতে পারছে না। এভাবে চললে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কর্মীদের ঠিকমতো বেতন-ভাতা দিতে পারবে না। ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মী ছাঁটাই করতে বাধ্য হবে। বেকারত্ব বাড়বে।

আমদানী-রপ্তানী হ্রাস: বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দায় এমনিতেই বিদেশী ক্রেতারা তাদের ক্রয়াদেশ কমিয়ে দিচ্ছে। হরতাল-অবরোধের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে সময়মতো পণ্য বন্দরে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন বাধা সৃষ্টি হবে, পাশাপাশি পণ্যের জাহাজীকরণও হবে বাধাগ্রস্ত। এ সুযোগে ক্রেতারা তাদের ক্রয়াদেশ আরও কমিয়ে দেবে। আগের দেওয়া ক্রয়াদেশ নিশ্চিত করতে দেরি করবে। রাজনৈতিক এসব কর্মসূচি কারও উপকার বয়ে আনে না।

কর্মসংস্থান হ্রাস: রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। বিনিয়োগের টাকা ফেরত আসা, পণ্যের বাজারজাতকরণ, শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনা, বিনিয়োগ ঝুকি, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তারা ভাবতে শুরু করছেন। এমতাবস্থায় ব্যবসায়ীগণ নতুন কর্মী নিয়োগের পরিবর্তে কর্মী ছাটাই করার কথা ভাবছে। ফলে নতুন কর্মসংস্থান হবে না, বরং কর্মসংস্থান আরও কমবে। যার প্রভাবে বেড়ে যেতে পারে বেকারের সংখ্যা।

বিদেশী বিনিয়োগ হ্রাস: বিদেশীরা রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ দেখলে বিনিয়োগ করে না। হরতাল অবরোধ থাকলে পণ্য আমদানি ও রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বিদেশী বিনিয়োগ পরিস্থিতি আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। ফলে, এখন দেশের অর্থনীতি অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে।

অর্থনীতিতে সংকট: হরতাল-অবরোধ, জ্বালাও-পোড়ায়ের কারণে দেশে অর্থনীতিতে সংকট আরও বাড়াবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন গবেষক, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার ও ব্যবসায়ীরা। তারা বলছেন, দুই বছরের করোনা মহামারীর ধাক্কা কাটতে না কাটতেই পৌনে দুই বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে এমনিতেই সংকটে আছে দেশের অর্থনীতি।

ফের রাজনীতির মাঠ সহিংস হয়ে উঠলে দেশে অর্থনীতিতে সংকট প্রকট আকার ধারণ করবে।

বস্ত্র শিল্পের সংকট: দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক শিল্প। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ইসরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ, ইত্যাদি বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে বস্ত্র ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদা কমছে। বৈশ্বিক পরিস্থিতির সাথে দেশের ভেতরে অবরোধের অস্থিরতা সৃষ্টি হলে রপ্তানিমুখী শিল্প খুবই সংকটে পড়বে। অস্থিরতার কারণে ক্রেতারা বিকল্প খুঁজবেন। এ ধরণের অচলাবস্থায় বস্ত্র শিল্প সংকটে পড়বে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আইসিটিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় জানিয়েছেন ২৮ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াতে ইসলামী ও তাদের সহযোগীদের ৬ দিনের অবরোধ-হরতালে অর্থনীতির আনুমানিক ক্ষতি হয়েছে ৩ দশমিক ৫ বিলিয়নের ডলারের বেশি।

বাংলাদেশে বর্তমানে বছরে প্রায় ৫০ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। সে হিসেবে এক দিনের হরতাল বা অবরোধে দেশের ক্ষতি হয় প্রায় ১৪ হাজার কোটি ডলার। দেশের অর্থণীতি সচল রাখতে হরতাল-অবরোধের মত কর্মসূচী পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

লেখক: অধ্যাপক, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

শর্তহীন সংলাপের প্রস্তাবে কেন ভিসানীতির হুমকি?

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করার পর আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টিকে শর্তহীন আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়ে চিঠি দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু। পাশাপাশি যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করবে তাদের বিরুদ্ধে পূর্বঘোষিত মার্কিন ভিসানীতি (থ্রিসি) কার্যকর হবে বলে হুমকি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

সোমবার ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র স্টিফেন ইবেলি এক বিবৃতিতে জানান, ‘যুক্তরাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বাংলাদেশে একটি অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায়। আমরা সব পক্ষকে সহিংসতা পরিহার এবং সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানাই। যুক্তরাষ্ট্র কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না।’বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতির বিষয়টি মনে করিয়ে বলা হয়, যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করবে তাদের বিরুদ্ধে পূর্বঘোষিত মার্কিন ভিসানীতি (থ্রিসি) কার্যকর হবে।

এরআগে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে ভারত। গত শনিবার ভারত নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দেয়, যা আমেরিকার সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতের বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা জানিয়ে দেন, মার্কিন প্রশাসনকে তাঁরা বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের অভিমত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘ভারত মনে করে বাংলাদেশের নির্বাচন সে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। অন্য কোনও দেশের সেখানে হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই।’ শুধু সংবিধান ও আইন অনুযায়ীই বাংলাদেশে নির্বাচন চায় চীন। আর ওই নির্বাচন নিয়ে বাইরের কারো হস্তক্ষেপ চায় না দেশটি। চীন নিজেও অন্য দেশে হস্তক্ষেপ করে না। ৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি পাঁচতারা হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। এমনকি বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু রাশিয়াও বাইরের হস্তক্ষেপের চায় না বলে জানিয়ে দিয়েছে।

এর আগেও দলগুলোর মধ্যে শর্তহীন সংলাপের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। জবাবে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়ে দেন, বিএনপি সন্ত্রাসী দল। তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, ‘জো বাইডেন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প কি কথা বলেন, মুখোমুখি বসে বৈঠক করেন? ওঁরা যেদিন করবেন, সেদিন আমি করব।’একই ভাবে সোমবার খুলনায় আওয়ামী লীগের জনসভায় শেখ হাসিনা জানিয়ে দেন, ‘বিএনপি মুন্ডুহীন দল। তাদের এক নেতা পলাতক আসামি, এক নেতা কারাগারের আসামি। সেই দল দেশে নির্বাচন হতে দিতে চায় না। অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায়। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, কেউ যদি গাড়িতে আগুন দিয়ে পোড়াতে চেষ্টা করে, ওই হাত ওই আগুনে পুড়িয়ে দেবেন, উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেবেন, যেন আর কেউ সাহস না পায় দেশের মানুষের ক্ষতি করতে।’

প্রধানমন্ত্রীর কথায় পরিস্কার বিএনপির সাথে কোনো সংলাপে বসবে না আওয়ামী লীগ। যদিও এই প্রধানমন্ত্রী বিএনপির বিষয়ে অনেকটা

নমনীয় ছিল। দাবি আদায়ে বিএনপি যদি কার্যালয় ঘেরাও করতে চায়, তাহলে তাদের চা খাওয়ানোর কথা জানিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যদিও প্রধানমন্ত্রীর এই আমন্ত্রণ নিয়ে তাচ্ছিল্য করেছিল বিএনপি। দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছিলেন, ‘চা খাওয়ার আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার মেনে নেওয়ার কথা বলুন।’

বিএনপি বরাবরই বলে আসছে, শেখ হাসিনা সরকারের অধীনে তারা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে অবিচল দলটি। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের কথা বললেও বিএনপি তার আগে একটি শর্ত জুড়ে দিয়ে এসেছে। স্বভাবতই এখন প্রশ্ন উঠেছে- এতো দিন যে দলটি শর্তহীন সংলাপ বসতে চায়নি, সেই দলটি লুর কথায় সংলাপে বসবে? সংলাপে বসা ছাড়া বিএনপির সামনে সত্যিই কী আর কোনো পথ খোলা আছে? বিএনপি সংলাপ চাইলেও আওয়ামী লীগ কি তাদের সাথে সংলাপে বসতে রাজি হবে? সংলাপে বসে হবে টা কী? তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র কেন সংলাপের কথা বলছেন? বাংলাদেশ নিয়ে তাদের এতো আগ্রহ কেন? কেনই বা তারা সংলাপের আহবান জানানোর পাশাপাশি ভিসানীতির হুমকি দিয়েছে?

যে দলটির জন্য যুক্তরাষ্ট্র শর্তহীন সংলাপের আহবান জানিয়েছে, সেই দলটি কখনই সুস্থ রাজনৈতিক ধারায় বিশ্বাসী ছিলোনা। ফলে আজ পর্যন্ত কোনো সংলাপেই সফলতা আসেনি। যখনই সংলাপের কথা এসেছে, তখনই হয় সংলাপ বর্জন করেছে অথবা শর্ত জুড়ে দিয়ে তা বানচাল করে দিয়েছে তারা। এবারের মতো ২০১৪ তেও সংলাপে অংশ নেয়নি, আর ২০০৭ ও ২০১৮ তে সংলাপে বসলেও শর্ত জুড়ে দিয়ে ও মিথ্যাচার করে সংলাপগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছ। এছাড়া নির্বাচন কমিশন যত বারই আলোচনার জন্য বিএনপিকে ডেকেছে, তারা যোগদান করেনি। গত বছরেও একই কাজ করেছে দলটি। যদিও তাদের প্রভুর আহবানে ‘আত্মগোপনে’ থাকা দলটি সংলাপে বসতে পারে। কিন্তু বিএনপি আলোচনা বসতে চাইলে যে সংলাপ হবে এমনটি নয়। কারণ সংলাপের ট্রেন হাতছাড়া করেছে বিএনপি। কারণ আওয়ামী লীগ শর্তহীন সংলাপের কথা এতো দিন বলে এসেছিল। সেই আহবানকে কোনো পাত্তাই দেয়নি বিএনপি। এখন আওয়ামী লীগ কী তাদের সাথে সংলাপে বসবে? এটাই এখন বড় প্রশ্ন।

প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন ‘খুনি দলের সাথে কিসের সংলাপ।’ কিন্তু রাজনীতিতে শেষ বলে কিছু নেই। প্রধানমন্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে কোনো কাজ করানো যায়না। তবে ভালোবাসায় তাকে জয় করা সম্ভব। এমন উদাহরণ ভুরিভুরি আছে। খালেদা জিয়াকে মুক্তির জন্য টানা আন্দোলন

করেছিল বিএনপি। তবুও প্রধানমন্ত্রীকে এক চুলও নড়াতে পারেনি তারা। অথচ খালেদা জিয়ার ভাই শামিম ইস্কান্দারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কারাগারের পরিবর্তে বেগম জিয়াকে বাসায় থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকার উৎখাতের হুমকি দিয়ে যাকে টলানো যায়নি অথচ তিনিই মানবতার জন্য আবেদনে সাড়া দিয়েছেন।

এই খালেদা জিয়া কিন্তু শেখ হাসিনার মুখের সামনে তার বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অথচ ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর মৃত্যুর পর খালেদা জিয়াকে শান্তনা দিতে ওই বাসায় গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। খালেদার বড় ছেলের পরিকল্পনায় ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা হয়েছিল, জিয়াউর রহমানের মদদে ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল। তবুও বয়স্ক খালেদা জিয়ার প্রতি সহানুভুতি দেখিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেমন কঠিন, তেমনি মহানুভবও। তাই ভয় দেখিয়ে নয়, ভালোবেসে খুব সহজে তাকে জয় করা সম্ভব।
লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

শিক্ষা ও অর্থনীতিতে হরতাল-অবরোধের প্রভাব

বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মঘট এবং অবরোধের কারণে নানান সমস্যা দেখা যায়। এসব সমস্যা সাধারণ জনগণের উপর উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলছে। প্রায়ই রাজনৈতিক বিরোধ, অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং সামাজিক উত্তেজনার ফলাফল সূদূঢ়প্রসারী হয়।

নাগরিকদের মঙ্গলের জন্য এসব দাবি করা হলেও কৌশলগত দুর্বলতার কারণে মারাত্মক প্রভাব ফেলে জনজীবনে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজে ব্যাঘাত ঘটে। ধর্মঘট ও অবরোধ পরিবহন ব্যবস্থাকে অচল করে দেয়। যার প্রভাব পরে অর্থনীতিতে।

এমন কি যারা সকালে কর্মস্থলে যাচ্ছে, তারা যে দলই করুক না কেন, হরতালের কারণে সংকটের মুখে পড়ে। সাধারণ জনগণের যাতায়াতের ক্ষেত্রে মারাত্মক অসুবিধা দেখা যায়। রাস্তা অবরুদ্ধ হলে

নগরজীবনে নানান ভোগান্তি দেখা যায়। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বন্ধ হয়ে গেলে অসংখ্য মানুষের কাজে সমস্যা হয়। এই সমস্যা যেমন মানবিক, তেমনি আর্থিক।

হাজার কোটি টাকার ক্ষতি
হরতাল অবরোধের কারণে সাধারণ কলকারখানা বন্ধ রাখেন মালিকেরা। এতে কত শ্রমঘণ্টা নষ্ট হয় তা নিয়ে গবেষণার সুযোগ আছে। ২০১৩ সালে ঢাকা চেম্বারের হিসাবে, পাইকারি বাজার, শপিং মল, শোরুম, ক্ষুদ্র্র ও ছোট দোকান প্রতিদিন ৬০০ কোটি আর বছরে ২৪ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়।

বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির দাবি, হরতালে দেশের ২০ লাখ দোকানে প্রতিদিন ক্ষতি হয় ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকা। ঢাকা সড়ক পরিবহন সমিতির হিসাবে, হরতালের দিন দিনের বেলায় সারা দেশে গড়ে কমপক্ষে সাড়ে তিন লাখ বাস-মিনিবাস ও ট্রাক চলাচল বন্ধ থাকে। এ কারণে ওই সব দিন অন্তত ২৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। এই পরিসংখ্যান ২০১৩ সালের, সেই হিসেবে ২০১৩ সালে ক্ষতির পরিমাণ আরও ৩০ গুণ বেশি ধরে নিতে পারি আমরা।

২০১৩ সালের তথ্য বলছে, এফবিসিসিআইয়ের হিসাবে, এক দিনের হরতালে দেশের জিডিপির দশমিক ১২ শতাংশ ক্ষতি হয়। ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশের (আইসিসিবি) হিসাবে, এক দিনের হরতালে এক হাজার ৫৪০ কোটি টাকার (২০ কোটি ডলার) ক্ষতি হয়। হরতালে ক্ষতির একটি হিসাব করেছে ঢাকা চেম্বারও।

সংগঠনটির হিসাবে, এক দিনের হরতালে দেশের এক হাজার ৬০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। বছরে গড়ে ৪০ দিন হরতাল হয়। সে দিক থেকে হরতালে এক বছরে ক্ষতি হয় ৬৪ হাজার কোটি টাকা।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর হরতালের কারণে যে ক্ষতি হয়েছে, তা বাংলাদেশের জিডিপির ৪ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশের সমান। বাংলাদেশের হরতাল নিয়ে ২০০৫ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) গবেষণায় বলা হয়, ১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর হরতালের কারণে দেশের জিডিপির ৩ থেকে ৪ শতাংশের সমান আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) তথ্য অনুসারে ২০১৫ সালের হিসেবে অবরোধ-হরতালে প্রতিদিন দেশের ব্যবসা- বাণিজ্যের ক্ষতি হয় ২ হাজার ২৭৭ কোটি ৮৬ লাখ টাকা।)। এক কথায়

বলা যায়, ক্ষতির অংক অনেক বড়।

রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যাপকভাবে খেয়াল করা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষ করে ছোট উদ্যোগ ও মাঝারি ধরণের উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ ও বাধার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দৈনিক মজুরি নির্ভর শ্রমিক ও ছোট ব্যবসার মালিকদের আর্থিক ক্ষতি পরিবারগুলিকে আর্থিক কষ্টের মধ্যে ঠেলে দিতে পারে। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও বাধাগ্রস্ত হয়। বিনিয়োগকারীরা রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল পরিবেশে বিনিয়োগ করতে দ্বিধায় থাকে। সামগ্রিকভাবে বিদেশী ও দেশীয় বিনিয়োগ হ্রাস পায়।

শিক্ষাখাতের যত সংকট
রাজনৈতিক অস্থিরতায় উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া আরেকটি খাত হচ্ছে শিক্ষা। ধর্মঘট বা বিক্ষোভের সময় স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এতে একাডেমিক ক্যালেন্ডার ব্যাহত হয়। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পড়াশোনা ও ফলাফল প্রভাবিত হচ্ছে।

আগামী নির্বাচন উপলক্ষ্যে ২০২৩ সালের শেষ দুটি মাস বেশ ঘটনাবহুল হবে বলা যায়। আবার নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাস কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার মৌসুম। আমরা দেখছি, প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব স্তরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা থাকে এ সময়ে।

প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষা, এসএসসি বা পাবলিক পরীক্ষার টেস্ট পরীক্ষা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন পরীক্ষা থাকে, বা এই সময়ে ভর্তির মৌসুম শুরু হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের তিন কোটি ৭০ লাখ শিক্ষার্থী আর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩০ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য এই সময় বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষাবর্ষের বড় একটি সময় ক্লাস করতে না পারার ঝুঁকিতে থাকে শিক্ষার্থীরা। আগেও আমরা দেখেছি হরতাল-অবরোধের কারণে শিক্ষাব্যবস্থা চরম হুমকির মুখে পড়ে। হরতালের কারণে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাস মিস স্বাভাবিক। হরতালের কারণে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রস্তুতি ব্যাহত হয়।

২০১৪ সালে দেখা যায় ছুটি ও হরতাল-অবরোধের কারণে ২০৮ দিন ক্লাসে

শিক্ষার্থীরা আসেনি। হরতাল-অবরোধ যদি সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তাহলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার বিষয়টিকে মাথায় রাখা প্রয়োজন কিন্তু।

পরিশেষে বলতে চাই, হরতাল বা অবরোধের মত রাজনৈতিক মাধ্যম সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। এই বিষয়গুলো অনেক সেনসেটিভ বিষয়।

এখন ২০২৩ সাল, ১৯৮৩ সালের বাংলাদেশ কিংবা পৃথিবী নেই। পৃথিবী সামনে এগিয়েছে, রাজনৈতিকভাবেও আমরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বিকল্প ও আরও কার্যকর রাজনৈতিকভাবে অধিকার আদায়ের কৌশল খোঁজা প্রয়োজন সব রাজনৈতিক দলের।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শেখ হাসিনার পাশে ভারতের থাকা কেন জরুরি

ভারতে রাজনৈতিক বিবাদের শেষ নেই। রাজনৈতিক দলগুলি একশোটির মধ্যে ৯৯টি ক্ষেত্রে সহমত হতে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশের বিপদে-আপদে বিশেষ করে শেখ হাসিনা সরকারের পাশে থাকার প্রশ্নে ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের মধ্যে কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। তার পিছনে কাজ করে একটি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতাবোধ।

‘বাংলাদেশে আমেরিকার দাদাগিরি, ভারত হাত গুটিয়ে থাকতে পারে না’—এই শিরোনামে গত ৪ জুন ‘দ্য ওয়াল’-এ আমার একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। দু-দেশের সম্পর্ক এবং বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতের স্বার্থের দিকটি আমি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলাম এবং বলেছিলাম, ভারতের জন্য শেখ হাসিনার সরকারের কেন বিকল্প নেই। ঘুরিয়ে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়, বাংলাদেশের মানুষ চতুর্থবারের জন্য মুজিব কন্যাকে ক্ষমতায় রেখে দিলে আমরা প্রতিবেশীরা উপকৃত হব।

তার মানে কি বাংলাদেশের মানুষ ভারতের স্বার্থের কথা বিবেচনায় রেখে সরকার নির্বাচন করবে? মোটেই এমন অন্যায় দাবি করা চলে না।

কিন্তু ভারতের সঙ্গে শেখ হাসিনা সরকারের সম্পর্কের রসায়নটি সে দেশের নাগরিকদের বিবেচনায় রাখা দরকার।

একথা ঠিক নরেন্দ্র মোদী যতই তাঁর সময়ের ভারতকে ‘বিশ্বগুরু’ হিসাবে তুলে ধরুন না কেন, বাংলাদেশ বাদে বাকি নিকট প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। নেপাল-পাকিস্তান বহুদিন হল চীনের খপ্পরে পড়েছে। মালদ্বীপে হালে চিনপন্থী সরকার ক্ষমতায় এসেই নয়াদিল্লিকে চোখ রাঙাতে শুরু করেছে। ভুটানের সঙ্গেও জি শিংপিনের দেশের সখ্য বাড়ছে। এই ক্ষেত্রে ভারতের কূটনৈতিক ব্যর্থতা অবশ্যই আছে। একই সঙ্গে সত্যি বাংলাদেশে বাদে বাকিগুলিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অন্ধ ভারত বিরোধিতা অন্যতম কারণ। জিয়াউর রহমানের সময় থেকেই বিএনপি নিজেদের ভারত বিরোধী শক্তি হিসাবে তুলে ধরেছে। একদা শাসক দল এবং প্রথমসারির পার্টির থেকে যে কূটনৈতিক অবস্থান অপ্রত্যাশিত। তারপরও ভারত বাংলাদেশের বিরোধী দলের জন্য দরজা বন্ধ করে দেয়নি। সম্প্রতি বিএনপির স্থায়ী কমিটির এক সদস্য দিল্লি ঘুরে গেছেন। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না, কথা দিয়েও ঢাকা সফরে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেননি বেগম জিয়া। তারপরও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বিএনপি সুপ্রিমোর সঙ্গে দেখা করেন।

তবে এটাই ভারতের শেখ হাসিনার পাশে থাকার একমাত্র কারণ নয়। ভারতের আজকের নরেন্দ্র মোদী সরকার বলে নয়, বিগত আড়াই-তিন দশকে সব সরকারের সময়ে সম্পর্কের ধারাবাহিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করলে লাভ-লোকসানের বিষয়টি স্পষ্ট হবে। নরেন্দ্র মোদী হামেশাই দাবি করে থাকেন, তাঁর সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায় উঠেছে। আমি বলব, এই অনন্য সম্পর্কের ভিত গড়ে ছিলেন মনমোহন সিং তাঁর ‘লুক-ইস্ট’ পলিসির মাধ্যমে। মোদী সরকার সেই একই নীতির নাম দিয়েছে ‘অ্যাক্ট ইস্ট’।

বাংলাদেশের বিগত সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতের একটি জনপ্রিয় ইংরেজি সংবাদ বাতায়নে দেশের হিন্দু জাতিয়তাবাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের মুখপত্র ‘অর্গানাইজার’-এর প্রাক্তন সম্পাদক সেশাদ্রি চারি লিখেছিলেন, ‘বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভারতের জন্য ভাল।’ বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত গুরুত্বের প্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক, নিরাপত্তা ও কৌশলগত উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেছিলেন তিনি। তাঁর কথায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ‘অ্যাক্ট ইস্ট’ উদ্যোগ সফল করে তোলার জন্যও বাংলাদেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই নীতির মূল কথা হল বাংলাদেশ-সহ পূর্ব ও উত্তর-পূর্বের

দেশেগুলির সঙ্গেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

বাংলাদেশে হাসিনার পনেরো বছর এবং ভারতে মনমোহন-মোদী সরকারের বিশ বছরের রাজত্বের তাৎপর্যপূর্ণ মিলটি হল, বৃহৎ পরিকাঠামো অর্থাৎ শিল্পতালুক, এক্সপ্রেসওয়ে, সেতু, উড়ালপুল, বন্দর, গভীর সমুদ্র বন্দর, বিমানবন্দর, আন্ডারপাস, রেল, মেট্রোরেলের প্রসার। নরেন্দ্র মোদী ভোটমুখী রাজ্যগুলিতে নিয়ম করে এই ধরনের প্রকল্পের উদ্বোধন করছেন যার অনেকগুলিই তাঁর পূর্বসূরির সময়ে শুরু অথবা পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পরিকাঠামোর উন্নয়নে ভারতে বড় ধরনের রাজনৈতিক বিবাদ নেই।

একই সময়ে বাংলাদেশে পরিকাঠামোর রূপবদলও চমৎকৃত হওয়ার মতো। পদ্মাসেতু দু’বার চাক্ষুষ করার সুযোগ হয়েছে আমার। সেটা শুধু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চমক নয়, প্রকল্পটির বাস্তবায়ন প্রশাসকের সাহসেরও নজির। কারণ সেতুটি নিয়ে বিবাদ, বিতর্ক, বাধা, ষড়যন্ত্র অজানা নয়। তাতে একটা বিষয় স্পষ্ট বাংলাদেশের প্রশাসনে কাঁকড়া সংস্কৃতি যে রূপ ধারণ করেছে ভারতে তুলনায় তা বেশ কম। পিছন থেকে টেনে ধরার সেই সংস্কৃতিকে পাশ কাটিয়ে পদ্মা সেতুর মতো প্রকল্পের শেষ পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারাটা অনেক বড় অসাধ্য সাধন।

সাম্প্রতিক অতীতে ঢাকায় মেট্রো রেল, এক্সপ্রেসওয়ে, উড়াল এক্সপ্রেসওয়ে, চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর তলদেশে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম আন্ডারপাস চালু, গভীর সমুদ্র বন্দরের শিলান্যাস দেশটির অর্থনৈতিক ভিত আরও মজবুত করবে সন্দেহ নেই। সম্প্রতি দুই প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে ৭০ বছর বন্ধ থাকা আখাউড়া-আগরতলা রেলপথটি চালু করেছেন। এই প্রকল্পটি ছিল মনমোহন সরকারের ভাবনা, যা মোদীর হাত দিয়ে বাস্তবায়িত হল। পরিকাঠামোর অগ্রগতিতে এই যৌথভাবনা তিন দশক আগে শুরু হলে দুই দেশেরই চেহারা বদলে যেত।

কলকাতা থেকে এখন ট্রেনে অসম হয়ে আগরতলা যেতে ৩৮ ঘণ্টা লাগে। আখাউড়া-আগরতলা রেল সংযোগের ফলে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে মাত্র ১২ ঘণ্টায় আগরতলা পৌঁছানো সম্ভব। আশা করা যায় অল্পদিনের মধ্যেই দু-দেশের মানুষ এই সুবিধা পাবেন। কলকাতায় আসতে একই সুবিধা কি বাংলাদেশের পূর্বাংশের মানুষ পাবেন না?

দুর্ভাগ্যের হল, দুই দেশের মানুষের উপকৃত হওয়ার কথাটি বাংলাদেশের বহু মানুষ পাশ কাটিয়ে যান। বিশেষ করে বিরোধী দলগুলি। তারা বলে, হাসিনা প্রকল্প গড়ছেন ভারতের স্বার্থে। বর্তমান সরকার চট্টগ্রাম

ও মংলা বন্দর ভারতকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। এরফলে ভারতের পণ্য অনেক সহজে ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে কম খরচ ও সময়ে পৌঁছে দেওয়া যাবে। আশপাশের দেশগুলিতেও সহজে ভারতীয় পণ্য পৌঁছে যাবে। বাংলাদেশে আমি বহু মানুষকে শুধু এটুকু বলেই অনুযোগ করতে শুনেছি। তারা একবারের জন্যও বলেন না কলকাতা-সহ ভারতের একাধিক বন্দর বাংলাদেশও ব্যবহারের সুযোগ পাবে।

প্রশাসনিক পরিভাষায় একে বলে ট্রানজিট। কিন্তু সুস্থ থাকার সময় খালেদা জিয়া লাগাতার প্রচার করেছেন শেখ হাসিনা ভারতকে বাংলাদেশের ভিতর ‘করিডর’ দিচ্ছেন। অর্থাৎ সেগুলি শুধুমাত্র ভারত ব্যবহার করতে পারবে। বাস্তবে, সেটা ট্রানজিট এবং এর মাধ্যমে পণ্যমাশুল এবং অন্যান্য কর বাবদ বাংলাদেশ বিপুল অর্থ উপার্জন করছে। নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার মতো বাংলাদেশ যে এখনও চীনের ঋণের জালে জড়িয়ে যায়নি তার জন্যও ভারতের কৃতিত্ব প্রাপ্য। তিস্তার জল নিয়ে সে দেশে বহু মানুষের ঘুম ছুটে গিয়েছে। তাঁরা একবারের জন্যও স্বীকার করেন না, জ্যোতি বসুর মধ্যস্থতায় হাসিনা ও দেবগৌড়ার সময় স্বাক্ষরিত গঙ্গা জল চুক্তি তিন বছর পর তিন দশর পেরবে।

শেখ হাসিনার সময়ে বাংলাদেশে জঙ্গি দমন অভিযানের মাধ্যমেও ভারত উপকৃত হয়েছে। সেশাদ্রি চারির কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারত বিরোধী শক্তিকে দমনে শেখ হাসিনার সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম রাজ্য তথা দেশের ওই প্রান্তে শাসক দল বিজেপির প্রধান মুখ এবং নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহদের কাছের মানুষ অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। গত সেপ্টেম্বরে জি-২০ সম্মেলনে শেখ হাসিনার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর একান্ত বৈঠকের পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রক কর্তৃক প্রচারিত প্রেস নোটে বলা হয়, ‘ভারতের প্রধানমন্ত্রী সে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্যমান শান্তিপূর্ণ অবস্থা নিশ্চিতকরণে অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।’

অন্যদিকে, সেই বৈঠক নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলায় টুইট সেইজঙ্গি দমনের প্রসঙ্গে ফিরি। এই ব্যাপারে ভারতের লাভ নিশ্চয়ই হাসিনা সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল না। আসলে মৌলবাদী শক্তি এবং জঙ্গি দমন করা না গেলে সে দেশে আজকের উন্নয়ন যাত্রা সম্ভব হত না। সেই অভিযান ছিল বিএনপি জমানার জঞ্জাল মুক্ত করা। তবে বাংলাদেশ ফের মৌলবাদীদের প্রতি দুর্বল কোনও শক্তির হাতে পড়লে বিপদ গোটা উপমহাদেশের। মৌলবাদীদের দেশ, ধর্ম বলে কিছু হয় না।

বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিলে ভারতে প্রতিস্পর্ধী মৌলবাদীরা আরও ফনা তুলবে। তাতে দুপারেই সংখ্যালঘুরা বেশি বিপন্নতার শিকার হবেন। এই কারণেও বাংলাদেশের ভোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে এপারের মানুষও ভাবিত।

নির্বাচন নিয়ে কোনও দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর প্রশ্ন ওঠে না। গত শুক্রবার ভারতের বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা এই ব্যাপারে নয়াদিল্লির অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। একই কথা মার্কিন বিদেশমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনকেও জানিয়ে দিয়েছেন যাঁর দেশ বাংলাদেশে ভিসা নীতি প্রয়োগ-সহ একাধির বিধিনিষেধ প্রয়োগ করে সরাসরি নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করছে।

তবে একথা সকলেই মানবেন, চলমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে কোনও দেশের নির্বাচনের ঘাত-প্রতিঘাত শুধুমাত্র সে দেশের ওঠাপড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। চলমান বিশ্ব পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রেখেই প্রতিবেশী হিসাবে বাংলাদেশকে নিয়ে ভারত হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না।

ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জনমানসে যে আবেগ বহমান, শেখ মুজিবুরকে সপরিবারে হত্যা, সামরিক শাসকদের স্বৈর শাসন, মৌলবাদী শক্তির উত্থান এবং ধারাবাহিক রাজনৈতিক বৈরিতার কারণেই বছর দশ-পনেরো আগেও দেখেছি, সাধারণ বাংলাদেশিদের অনেকের মধ্যেই দেশ নিয়ে ছিঁটেফোটা গর্ববোধ নেই। এমন দেশে উন্নয়ন ঘিরে দুর্নীতি, অগণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল, ভোটে অনিয়ম, দাদাগিরি, সিন্ডিকেটরাজের সংস্কৃতি মাথা তোলা অস্বাভাবিক নয়। নির্বাচন বয়কট, খুনখারাবি, জন-সম্পত্তি বিনষ্ট সেই অগণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলকে আরও শক্তিশালী করে।

লক্ষণীয়, বাংলাদেশের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্ব নিয়ে আমেরিকা বরাবর চুপ থেকেছে। তারা হঠাৎ গেল গেল রব তুলেছে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের নির্বাচন এগিয়ে আসতে। আন্তরিক সম্পর্কই ইঙ্গিত করেছিল। খেয়াল রাখতে হবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মাতৃভাষা গুজরাতি এবং ভারত সরকারের কাজের ভাষা হিন্দি ও ইংরেজি।

লেখক: ভারতীয় লেখক ও সাংবাদিক; এক্সিকিউটিভ এডিটর, দ্য ওয়াল, কলকাতা; বাংলাদেশ বিষয়ক পর্যবেক্ষক।

হরতাল-অবরোধে বাধাগ্রস্ত প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন

বাংলাদেশের অর্জনের মুকুটের সবচেয়ে মূল্যবান রত্নটি হচ্ছে কৃষিখাতের অবিস্মরণীয় অগ্রগতি। সারা বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বনির্ভর একটি দেশ। খাদ্যে স্বনির্ভরতার পাশাপাশি বাংলাদেশের মানুষকে পুষ্টি নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য ২০১৮ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ‘পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত‘ করার ঘোষণা দিয়েছলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা।

পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে শেখ হাসিনার সরকার বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছন। ক্রমবর্ধমান মানুষের অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর জন্য দেশে মাংস উৎপাদন বাড়ানোর জন্য গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের আওতায় প্রানীসম্পদ অধিদপ্তর কৃষকদের উৎসাহিত করছে, প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে গরু জবাই করার জন্য প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সরকার দেশের বিভিন্ন জেলায় আধুনিক কসাইখানা স্থাপন করছে।

কৃষকের খামারে বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদিত দুধ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেজিং করে বাজারজাত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের উৎসাহিত করার ব্যবস্থা রেখেছে সরকার। কিন্তু তারপরও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকার নানান কারণের মধ্যে একটি বড় কারণ হল রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সিন্ডিকেট।

দেশ যখন অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তখন কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এবং সরকার বিরোধী মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দেশকে অস্তিতিশীল করে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে একের পর এক হরতাল অবরোধ দিয়ে দেশের অগ্রসরমান অর্থনীতিকে ধসিয়ে দেয়ার হীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের (বিআইআইএসএস) সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ও অর্থনীতিবিদ মাহফুজ কবীর সময় সংবাদকে দেয়া এক বক্তব্যে বলেছেন, “২০১৩ সালে

বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার ছিল ১১ লাখ কোটি টাকা। যা ২০২৩ সালে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৫০ লাখ কোটি টাকা।

অর্থনীতির আকার বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরতালে দৈনিক ক্ষতির পরিমাণও বেড়েছে। বর্তমানে দেশে একদিনের হরতালে ক্ষতির পরিমাণ ৬ হাজার ৬৮০ কোটি টাকা”। সরকার বিরোধীদের হরতাল-অবরোধে ‘সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দিনমজুর ও এসএমই খাত।

সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, যা আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক উভয়কেই ইতোমধ্যে সংকটজনক অর্থনৈতিক সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। শিশু ও যুবকদের শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।’

অর্থনীতিবিদরা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, সরকারবিরোধীদের বিক্ষোভ দেশের অর্থনীতিতেও আঘাত হেনেছে। কোভিড-১৯ বিপর্যয় থেকে ঘুরে দাঁড়ানো অর্থনীতি এখন বৈদেশিক মুদ্র্রার ঘাটতি, টাকার মান ৩০ শতাংশের বেশি কমে যাওয়া, দুই অংকের মূল্যস্ফীতি, জ্বালানি ও শ্রমের উচ্চ মূল্যের সঙ্গে লড়াই করছে।

‘বৈশ্বিক অস্থিরতার যে প্রভাব দেশের অর্থনীতিতে পড়েছে সেখান থেকে এখনও বাংলাদেশ বের হয়ে আসতে পারেনি। অন্যদিকে বাজারে মূল্যস্ফীতিও রয়েছে উচ্চমাত্রায়। এই অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে হরতাল দেশের অর্থনীতিতে ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

রাজনীতি বিষয়ে বাংলাদেশি ইংরেজি ভাষার bdanalytica -এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধ থেকে জানা যায়, চলমান হরতালে ‘বাস এবং ট্রাকগুলোকে লক্ষ্য করে অন্তত ১১০টি অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। ফলে যোগাযোগ খাতে (ট্রান্সপোর্টেশনে) তৈরি হয়েছে কৃত্রিম অচলাবস্থা।

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মানুষ স্থানান্তরিত হতে পারছে না। মুখ থুবড়ে পড়ছে ব্যবসাসহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা কার্যক্রম। অর্থনৈগতিক গতিশীলতা ধরে রাখতে হরতাল উপেক্ষা করে কিছু মানুষ বের হলেও দুর্বৃত্তরা যখন বাসে আগুন দেয়া শুরু করলো, তখন জানমালের নিরাপত্তার জন্য মানুষ খুব বেশি প্রয়োজন না হলে ঘরের বাইরে বের হচ্ছে না, ব্যবসার জন্য মালামাল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে আসতে পারছে না। আতংকিত হয়ে পড়েছে মানুষ।

একান্ত জরুরী প্রয়োজন ছাড়া কেউই তেমন হরতালের দিনগুলোতে ঘরের বাইরে যাচ্ছে না। জীবন-জীবিকার তাগিদে হরতাল উপেক্ষা করে হাট-

বাজার খোলা থাকলেও বাজারগুলোতে নেই আগের মতো মানুষের ভিড়। হরতালে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা। ফলে গো-খাদ্য সহ সকল জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে।খামারিরাও খাদ্য ক্রয় করতে গিয়ে পড়ছেন বিপাকে। আবার পালিত গরু-ছাগল হাট-বাজারে নিয়ে গেলেও মিলছে না ক্রেতা। ফলে উভয় সংকটের মধ্য দিয়ে দিনানিপাত করছেন প্রান্তিক খামারিরা। অথচ কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় এবং দেশের আপামর জনগোষ্ঠির পুষ্টি নিরাপত্তায় প্রাণিসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৯০%, প্রবৃদ্ধির হার ৩.০৪% এবং মোট কৃষিজ জিডিপি’তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৬.৫২%। তাছাড়া ২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপির আকার ছিল ৬৭,১৮৯.০০ কোটি টাকা যা বিগত ২০২০-২১ অর্থ বছরের তুলনায় ১৬,৮৮৮.০০ কোটি টাকা বেশি (বিবিএস, ২০২২)।

২০২৩ সালে এসে বিরোধীদলের একের পর এক হরতাল অবরোধে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জিডিপিতে অবদান রাখা এই খাতটি। প্রাণিসম্পদ খাতের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে হলে রাজনৈতিক সহিংসতা পরিহার করতে হবে। মানুষসহ সকল প্রাণীর খাদ্য/পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি) দিনাজপুর-৫২০০।